RtF&SS
Campaign for Right to Food & Social Security
খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

খাদ্যের অধিকার ও খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি

অধ্যাপক এম এম আকাশ

খাদ্য অধিকার ও সামাজিক
নিরাপত্তা আন্দোলন

খাদ্যের অধিকার ও খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি

অধ্যাপক এম এম আকাশ
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RtF&SS Campaign for Right to Food & Social Security
খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

খাদ্যের অধিকার ও খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি

অধ্যাপক এম এম আকাশ, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক :
খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১২

সহায়তা :
Bread for the World (BftW), Germany and
NETZ Partnership for Development and Justice
e.V. Germany

গ্রন্থস্বত্ব :
খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন
বাড়ি নং ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মিঠু আহমেদ

প্রিন্টার : চৌধুরী প্রিন্টার্স এন্ড সাপ্লাই
৪৮/এ/১, বাড্ডানগর লেন, পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : ৫০ টাকা

ISBN : 978-984-33-5555-3

এই প্রবন্ধটির উপর ১২ মে ২০১২ ঢাকায় একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন সংযুক্তি হিসেবে ছাপা হলো। আশাকরি পাঠক এ বিষয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারবেন।

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

বাংলাদেশে ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা : অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা ৭

বাংলাদেশ : খাদ্য পরিস্থিতি ১১

বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে করণীয় সুপারিশ ১৬

- খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে ১৬
- উৎপাদকদের সমবায় গড়ে তুলতে হবে ১৭
- নিরাপত্তা জাল কর্মসূচির ফাঁক-ফোকর বন্ধ করতে হবে ১৭
- মজুদ বাড়াতে হবে, মজুদ ব্যবস্থাপনায় সমবায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ১৮
- দরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রেশনিং ১৮
- সঠিক তথ্যের ব্যবহার ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে ১৯

উপসংহার ২০

গ্রন্থপঞ্জি ২১

সংযুক্তি

সেমিনার প্রতিবেদন : খাদ্যের অধিকার ও খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি ২৩

সেমিনারের সুপারিশসমূহ ৩০

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ৩১

ভূমিকা

"খাদ্যের অধিকার" বা "অন্নের অধিকারের" বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের অন্যান্য অধিকারগুলি পুরণ না হলেও মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। কিন্তু খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মানুষের দৈহিক অস্তিত্বই ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। একাদি□মে দীর্ঘদিন "খাদ্য অধিকার" থেকে বঞ্চিত থাকলে মানুষের মৃত্যু হয়। তখন তার কাছে অন্য সব অধিকারই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফলে এ কথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো যে মানুষের মানবিক সকল অধিকারের বাস্তব পূর্বশর্ত যেহেতু মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব এবং মানুষের দৈহিক অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হচ্ছে "খাদ্য অধিকার" পুরণ, অতএব "খাদ্য অধিকার" মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

মনে হতে পারে যে "খাদ্যের অধিকার" মানুষের জন্য একটি জন্মগত অস্তিত্বগত অধিকার। অর্থাৎ এটি নিছক ব্যক্তিগত অধিকার নয়, এটি একটি প্রজাতিগত মানব অস্তিত্বের অধিকার। মানবসমাজকে যদি আমরা টিঁকিয়ে রাখতে বা বাঁচিয়ে রাখতে চাই তাহলে শ্রেণী, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী, নির্বিশেষে বিভিন্ন মানুষের জন্য এই অধিকারটি স্বীকৃত হওয়া উচিত। এই জন্যই সভ্য সমাজে শেষ পর্যন্ত এটি একটি সার্বজনীন মানব অধিকার (Universal Human Right) হিসাবে নীতি নির্ধারকরা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে কি সভ্য সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি পেট পুরে পছন্দমত খাবার খেতে পারছে? না পারছে না। আবার জন্মলগ্ন থেকেই কি সে একইভাবে অধিকার বঞ্চিত ছিল? হয়ত না। শুরুতে আদিম মানুষের হয়তো কিছু না কিছু খাদ্যের অধিকার প্রাকৃতিক কারণেই সুনিশ্চিত ছিল। তারপরেও প্রশ্ন, বর্তমানে জন্মলগ্নে একটি শিশুর খাদ্য অধিকার কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অত সহজ নয়। বাস্তবে যে শিশুটি মাতৃজঠরে প্রথম জন্ম নেয় তার "খাদ্যের অধিকার" তার জন্য একটি "স্বাভাবিক অধিকার" হিসাবেই বিরাজমান থাকে। কিন্তু একটু গভীরভাবে খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে জন্মগ্রহণের সময় থেকেই সৃষ্টি হতে পারে অসম সুযোগের সমস্যা। যদি মাতা গরীব হয় এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগেন তাহলে মাতৃজঠরেও শিশুটি যথাযথ মাত্রায় পুষ্টি অর্জনের সুযোগ পাবে না। সুতরাং সব শিশু একরকম পুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। যদিও আমরা প্রায়ই মনে করি যে, জন্মের অব্যবহিত পরেও মাতৃদুগ্ধে সব শিশুর রয়েছে স্বাভাবিক অধিকার এবং প্রকৃতিগতভাবে শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনও বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত, তাই এ ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না কিন্তু তারপরেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই মাতৃদুগ্ধে শিশুর অধিকারও প্রায়ই অপূর্ণ থেকে যায় বলে আমরা দেখতে পাই। গরীব মায়েরা পুষ্টিহীনতার কারণে সন্তানদের অনেক সময়ই পর্যাপ্ত দুধ দিতে পারেন না। আমরা লক্ষ্য করি এমনকি আজ ধনী মায়েরাও এ ক্ষেত্রে নিজ সন্তানের অধিকার লঙ্ঘন করে থাকেন। যে দেশ যত বেশি প্রাচুর্যশালী সে দেশে এ ধরনের মাতৃদুগ্ধে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তত বেশি। পশ্চিমা বিশ্ব মা-এর ব্যক্তিগত চয়নের অধিকারকে শিশুর জন্মগত খাদ্য অধিকারের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকে বলেই এমনটি ঘটে।

যাই হোক শিশুদের খাদ্যের অধিকারে যেমন বৈষম্য রয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও তেমনি খাদ্য অধিকারের ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য বিরাজমান। সমাজে যাদের বস্তুগত সম্পদ কম বা নেই, যারা সচরাচর শুধু শ্রমসম্পদের উপর নির্ভর করে বেঁচে

থাকেন, তাদের জীবনে খাদ্য নিরাপত্তা বা খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সবসময় থাকে না। প্রথমত: তারা কোনো কাজ বা উৎপাদনের উপায় নাও পেতে পারেন–সেক্ষেত্রে না পারবেন তারা খাদ্য বা অন্য কোন কিছু উৎপাদন করতে– না পারবেন কাজ করে অর্থ আয় করে তা দিয়ে খাদ্য কিনতে। অন্যের দান বা ভিক্ষার উপর নির্ভর করে তখন তাদের বেঁচে থাকতে হবে। আর যদি কাজ পাওয়ার পর নিম্ন উৎপাদনশীলতার কারণে বা অতিরিক্ত শোষণের কারণে তাদের আয় দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকে যায় তাহলেও তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালরি সংবলিত খাদ্য □য় করা সম্ভব হবে না। শ্রেণীবিভক্ত অনুন্নত সমাজে এরকম লোকের সংখ্যা অনেক।

সুতরাং খাদ্য অধিকারকে নীতি নির্ধারকরা সার্বজনীন মানব অধিকার হিসাবে আখ্যা দিলেও মানব সমাজে ধনী মানুষ ও গরীব মানুষের বাস্তব খাদ্য অধিকারে বৈষম্য বিদ্যমান। এমনকি শিশুর ক্ষেত্রেও শ্রেণীভেদে বা সংস্কৃতি ভেদে খাদ্য অধিকারের তারতম্য থেকেই যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রাচ্য সংস্কৃতিতে বিশেষত: ভারতবর্ষে নারীদেরকে মূলত দেখা হয় গৃহের খাদ্য প্রস্তুতকারী ও খাদ্য পরিবেশিকা হিসাবে। কিন্তু বাইরে থেকে খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপাদনের দায়িত্বটি এখনো মূলত: পুরুষদের ঘাড়েই রয়েছে। এর ফলে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক অভ্যস্ততা হচ্ছে ঘরে খাদ্য প্রস্তুত করে পরিবেশন করছেন নারী এবং সবার খাবার গ্রহণের পর তিনি খাদ্য গ্রহণ করছেন। একটি সামাজিক স্টাডিতে দেখা গেছে যে এই সবশেষে খাওয়ার সংস্কৃতির জন্য নারীরা প্রায়ই অবশিষ্ট খাদ্যটুকুই খান। ফলে প্রায়ই তাদের ভাগ্যে কোন প্রোটিনই জুটে না। আবার পুরুষ সন্তান ও উপার্জনকারী স্বামীর দেহরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ভারতে ও বাংলাদেশে নারীরা প্রায়ই নিজেরা ভালবেসে স্বেচ্ছায় ভাল খাবারটা নিজেরা গ্রহণ করেন না, পিতা, স্বামী বা পুত্রকে অর্পণ করেন। তাই এসব দেশে নারীদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং তাদের মৃত্যুর হারও বেশি। [লীলা দুবে ও সৌরভ দুবে, ১৯৮৭]

সবমিলিয়ে দেখা যাচ্ছে "খাদ্য অধিকার" বিষয়টি অত্যন্ত প্রাথমিক ও মৌলিক হলেও তা পুরণের ক্ষেত্রে রয়েছে এক বহুমাত্রিক জটিলতা। শুধু যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন হলেই এই জটিলতার অবসান হয় না। এখানে রয়েছে একগুচ্ছ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও লিঙ্গীয় সীমাবদ্ধতা। আর এই সীমাবদ্ধতাগুলি ষ্ট্যাটিক নয়। এর প্রতি□য়া বংশ পরম্পরায় প্রবাহমান (Inter Generationally Dynamic)।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা "খাদ্য" বিষয়টিকে নাগরিকদের অধিকারের দিক থেকেই বিবেচনা করেছি। কিন্তু আরেকটি দিক হচ্ছে দায়িত্বের দিক তথা খাদ্য উৎপাদনের দিক। একটি দেশের নাগরিকেরা কি খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করবে না কি খাদ্যের জন্য বাইরের উপর নির্ভর করবে? খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষককে কতটুকু প্রণোদনামূলক মূল্য দিতে হবে এবং সেই মূল্যে ভোক্তা শ্রেণীগুলি কি খাদ্য □য়ে সক্ষম হবেন, না হলে কিভাবে তাদের খাদ্য অধিকার সংরক্ষিত হবে এই বিভিন্ন প্রশ্নগুলোও অবশ্যই আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উলি-খিত বিভিন্ন ধরনের বিবেচনা ও সীমাবদ্ধতার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপ নিয়ে আলোচনা করবো এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কিভাবে বাংলাদেশের সকলের জন্য খাদ্য

অধিকার নিশ্চিত করা যায় তার একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশে ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা : অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা

বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষটি কেন্দ্র করে খাদ্য অধিকারের বঞ্চনার পেছনে সা□য় বিভিন্ন অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিয় ও ভূরাজনৈতিক সীমাবদ্ধনগুলি খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই জন্যই এই উদাহরণটি আমরা বিশেষভাবে বেছে নিয়েছি। তবে তারও আগে দুর্ভিক্ষের তত্ত্ব সম্পর্কে এ. কে সেনের কিছু প্রত্যয় সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরবো এবং সেই প্রত্যয়গুলির আলোকেই আমরা পরবর্তীতে বাংলাদেশের খাদ্য বঞ্চনার এই চরম দৃষ্টান্তটি বিশে-ষণ করবো।

সেনের মতে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে খাদ্য অধিকার বঞ্চনার একেবারে চরম খোলামেলা রূপ। আর "ক্ষুধা" হচ্ছে তিলে তিলে ক্ষয় হওয়ার প্র□য়া। বাইরে থেকে দেখে তা নাও বোঝা যেতে পারে। যদিও open famine বা দুর্ভিক্ষ ও endemic hunger বা ক্ষুধা দুটোই সমাজে খাদ্য অধিকার বঞ্চনার রূপ–কিন্তু দুর্ভিক্ষকেই নীতি নির্ধারকরা ভয় পান বেশি-বিশেষত: যদি সে দেশে গণতন্ত্র থাকে। কোন অঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন আমরা দেখি খাদ্যের অভাবে মানুষ প্রথমে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে– কিন্তু সেখানেও কোন ভিক্ষা না পাওয়ার ফলে–দিনের পর দিন অভূক্ত থেকে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। যখন এইভাবে পথে ঘাটে মৃত্যু শুরু হয় তখনই আমরা বলি দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। আধুনিক সভ্যতায় এবং বিশ্বায়নের এই যুগে এ ধরনের দৃশ্যমান খাদ্যাভাবে মৃত্যুর ঘটনা কমে এসেছে। তার প্রধান কারণ দ্রুত উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে অনুদ্বৃত্ত এলাকায় খাদ্যের প্রবাহ। যেটা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে খুব সহজে সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে অনুদ্বৃত্ত এলাকায় খাদ্য সরবরাহ সব সময় ঘটবেই এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না বা ঘটলেই মানুষ যে তা কিনতে পারবে তাও বলা যায় না। অমর্ত্য সেনের নানা ধরনের দুর্ভিক্ষ স্টাডি থেকে জানা যায় যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষের পেছনে মূলত: দুধরণের আশু কারণ থাকে। একটিকে তিনি বলেছেন "Food Availability Decline" বা খাদ্যের প্রাপ্যতা হ্রাস"। অপরটিকে বলেছেন "খাদ্য বিনিময়ের স্বত্ত্বাধিকারের ব্যর্থতা" বা Food exchange entitlement failure. খাদ্যের প্রাপ্যতা হ্রাস হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে, শস্যহানি থেকে বা যে কোন অন্য কারণে ফসল উৎপাদনে ব্যর্থতা সৃষ্টি হলে। এমতবস্থায় খাদ্যের ঘাটতি বাইরে থেকে আমদানি করে প্রাপ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হতে পারে যদি উদ্বৃত্ত খাদ্যের অধিকারী রাষ্ট্রগুলি থেকে তা যথাসময়ে আমদানি করতে ঘাটতি দেশটি অপারগ হয় অথবা নিজ দেশের খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে বা অন্য কোন ভূরাজনৈতিক কারণে উন্নত দেশটি খাদ্য রপ্তানিতে রাজী না হন। তবে অমর্ত্য সেনের লেখা থেকে বোঝা যায় যে, খাদ্য প্রাপ্তি কম বেশি যাই হোক না কেন, বন্টন দক্ষ হলে যেমন একটু কম খাদ্য নিয়েও দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্ভব তেমনি বেশি খাদ্য নিয়েও বন্টনের অদক্ষতার জন্য দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একই দেশের সব জায়গায় একই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সেজন্য বিশাল ফসলহানি ও বিশাল খাদ্য

ঘাটতি হওয়ার সম্ভবনা হয়তো কম। সেই অবস্থায় যদি আলোচ্য দেশটির দুর্যোগহীন উদ্বৃত্ত খাদ্য এলাকার মানুষরা তাদের দুর্যোগা□ান্ত অনুদ্বৃত্ত এলাকার মানুষদের সঙ্গে খাদ্য ভাগাভাগি করে নিতে সম্মত হয় অথবা বাজার প্র□িয়ার বাইরে ভর্তুকী দামে বা নিরাপত্তা জালের অংশ হিসাবে বিনামূল্যে সরকারের পক্ষে দুর্যোগা□ান্ত অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হয়, তাহলে এ ধরনের দেশে সবাই মিলে মিশে একটু কম খাবার খেলেও খোলা মেলা দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের একটি গণমুখী অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা জালের একটি সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা। এখানে কেউ বলতে পারেন যে দেশিয় খাদ্য উৎপাদন কমে গেলে অসুবিধা কি–বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করলেই তো চলবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে ভূরাজনৈতিক প্রতিকুলতার দরুন আমদানি আটকে যেতে পারে। ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বৃত্ত দেশটি খাদ্য রপ্তানি করতে নাও রাজি হতে পারে। আবার উচ্চ মূল্যে খাদ্য আমদানি করা গেলেও দেশিয় শাসকদের ভর্তুকী প্রদান ক্ষমতার অভাব ও খাদ্যের উচ্চমূল্যও এক্ষেত্রে বন্টনের সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

অমর্ত্য সেন আরো দেখিয়েছেন যে এমনকি অভ্যন্তরিণ গণতন্ত্রের অভাবও সাময়িক 'দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। চীনের উদাহরণ থেকে জানা যায় যে ১৯৫০ এর দশকে চীনের কোন কোন আঞ্চলিক পকেটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ১৯৫৮-৬১ কালপর্বে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষগুলিতে মৃত্যুর আনুমানিক সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। ভারতের তেতালি-শের মন্বন্তরে মৃত্যু সংখ্যার দশগুণ বেশি। এই দুর্ভিক্ষগুলির খবর ঠিক সময় মত চীনা প্রেসে প্রচারিত না হওয়ায় দেশের ভেতরে ও বাইরে অনেক মানুষ তখন এগুলির কথা জানতেই পারেন নি। আর চীনের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষও পাছে তাদের "মহাবেগে দাও লাফ" (The great leap) কর্মসূচির সাফল্য ম্-ান হয়ে যায়, তাই সেগুলি জানলেও তখন তা গোপন রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে নিজেরাই এক ধরনের আত্মপ্রতারণার শিকার হয়েছিলেন তদানীন্তন চীনা রাজনৈতিক নেতৃত্ব। অমর্ত্য সেনের মতে যদি চীনে গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা থাকতো এবং দুর্ভিক্ষের সঠিক খবর জনগণ তখনই জানতে পারতেন তাহলে চীনে সঠিক সময়ে জরুরিভাবে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষে এত বিশাল সংখ্যক জনগণের মৃত্যুকে বন্ধ করা সম্ভব না হলেও অন্তত: অনেকখানি কমানো সম্ভব ছিল। অমর্ত্য সেন তার 'Development as freedom' গ্রন্থে তার এই যুক্তিকে আরো শক্ত করে তুলে ধরার জন্য মাও এর একটি কৌতূহলদ্দীপক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। দুর্ভিক্ষের এক বছর পর ১৯৬২ সালে দুর্ভিক্ষের সত্যতা দেরিতে হলেও চীনা নেতৃবৃন্দ স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেডারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় কমরেড মাও নিজেই বলেছিলেন, "Without democracy you have no understanding of what is happening down below; the situation will be unclear; you will be unable to collect sufficient opinions from all sides; there can be no communication between top and bottom; top level organs of leadership will depend on one sided and incorrect material to decide issues, thus you will find it difficult to avoid being subjectivist; it will be impossible to achieve unity of understanding and unity of action, and impossible to achieve true centralism". [উদ্ধৃত হয়েছে এ. কে. সেন, ১৯৯৯, পৃ-১৮২, মূল উৎস: স্টুয়ার্ট আর ক্র্যাম, ১৯৭৬]

অতএব সেনের দুর্ভিক্ষ তত্ত্বের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে "খাদ্য প্রাপ্যতা হ্রাস", "খাদ্য বিনিময়ের স্বত্ত্বাধিকারের ব্যর্থতা", "সরকারি খাদ্য আমদানী ও যথাযথ বন্টনে ব্যর্থতা" "ভূরাজনীতি" ও আন্তর্জাতিক খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি" ইত্যাদি নানা কারণেই খাদ্যের চরম সংকট সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে বাংলাদেশে ১৯৭৪ এর যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে প্রথমটি ছাড়া এই সবগুলি কারণই সি□য় ছিল। আমরা জানি ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসাবানুসারে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার। বেসরকারি হিসাবে দাবী করা হয়েছিল যে একমাত্র রংপুর শহরেই মৃতের সংখ্যা ছিল আশি হাজার থেকে এক লাখ। (হক, মেহতা, রহমান ও উইগনাবাজা, ১৯৭৫) দুর্ভিক্ষ প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল রংপুরে এবং ময়মনসিংহে। কিন্তু উৎপাদনের তথ্যে দেখা যায় এই দুটি জেলায় ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৪ সালে খাদ্য উৎপাদনের মাথা পিছু প্রাপ্যতা না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল যথা□মে ১০ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ। (দেখুন মহিউদ্দিন আলমগীর, ১৯৭৮) তাহলে স্বভাবত:ই প্রশ্ন আসে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল কেন? অমর্ত্য সেনও দাবী করেন যে বাংলাদেশে ১৯৭১-৭৫ কালপর্বে মাথাপিছু খাদ্য শস্যের প্রাপ্যতা (Availability) ছিল নিম্নরূপ–

১৯৭১	=	১৪.৯ আউন্স
১৯৭২	=	১৫.৩ আউন্স
১৯৭৩	=	১৫.৩ আউন্স
১৯৭৪	=	১৫.৯ আউন্স
১৯৭৫	=	১৪.৯ আউন্স

ফলে স্বাভাবিক প্রশ্ন হচ্ছে এই সময়কালে সর্বোচ্চ খাদ্য প্রাপ্তি সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হলো কেন? সেনের মতে এর উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে "খাদ্য বিনিময়ের স্বত্ত্বাধিকার ব্যর্থতার" মাঝে। সহজ ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে বাজারে খাদ্য থাকলেও খাদ্য □য়ের ক্ষমতা বা পর্যাপ্ত আয় মানুষের হাতে ছিল না, এই ঘটনাটিই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ি। এই অনুমানটি পরীক্ষার জন্য আমরা তাকাতে পারি গ্রামের দরিদ্রতম অংশ দুর্ভিক্ষের প্রধান শিকার গ্রামীণ মজুরদের মজুরি ও চালের দামের তথ্যের দিকে। তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের তুলনায় গ্রামীণ মজুরি ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে বা দুর্ভিক্ষের মাস দুটিতে দৈনিক ৫.৭২ টাকা এবং ৫.৮৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল যথা□মে দৈনিক ৮.৮২ টাকা এবং ৮.৮০ টাকা (দেখুন মহিউদ্দিন আলমগীর, ১৯৭৮) অর্থাৎ আর্থিক মজুরি এক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছিল যথা□মে ৫৫ শতাংশ এবং ৪৭ শতাংশ। কিন্তু ঐ একই সময়ে চালের দাম বৃদ্ধির হার ছিল যথা□মে ১৩৮ শতাংশ এবং ১৬৭ শতাংশ। সুতরাং গ্রামের মজুরদের চাল কেনার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায় নি বরং হ্রাস পেয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। ফলে খাদ্য বাজারে থাকলেও-কিনে তারা তা খেতে পারেন নি। এইভাবে সেন তার অনুমানের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই দুর্ভিক্ষের আরেকটি ভিন্নধর্মী কিন্তু জিওপলিটিক্যাল ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের লেখায় ("খাদ্য ও দুর্ভিক্ষের রাজনীতি") অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মতে, ১৯৭৪ সালে সরকারের পক্ষে এমনিতেই খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় যথেষ্ট খাদ্য আমদানি করা সম্ভব ছিল না। সরকারকে মূলত:

নির্ভর করতে হয়েছে আমেরিকান খাদ্য সাহায্যের উপর। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় পি. এল ৪৮০র অধীনে বাংলাদেশকে যেটুকু খাদ্য সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা তারা সময়সূচি অনুযায়ি সরবরাহ করে নি বরং মিথ্যা অজুহাতে অত্যন্ত নাজুক দুইটি মাসে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে তারা খাদ্যবাহী জাহাজগুলোর গতিমুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল।[১] নীচে মাসওয়ারি খাদ্য আমদানীর তালিকা থেকেও বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হবে:-

তালিকা-১
বাংলাদেশে খাদ্য আমদানী চিত্রঃ ১৯৭৩-৭৪ (০০০টনে)

মাস	১৯৭৩	১৯৭৪
জানুয়ারি	২২৮	৩৮
ফেব্রুয়ারি	১৯৪	৯০
মার্চ	৪৬৭	৯৯
এপ্রিল	২১২	১৪৭
মে	১৭৯	২২৪
জুন	১২৬	১৩৫
জুলাই	৮৩	২৯১
আগস্ট	১৫৯	২২৫
সেপ্টেম্বর	২৬৩	২৯
অক্টোবর	২৮৭	৭৬
নভেম্বর	৫৯	১৯০
ডিসেম্বর	৮৩	১৪৯
মোট	**২৩৪০**	**১৬৯৩**

তালিকায় দেখা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের তীব্রতম মাস দুটিতেই খাদ্য আমদানীর মাত্রা সবচেয়ে কম ছিল। সুতরাং খাদ্য আমদানীর বিশেষ বিশেষ মাসে বিপজ্জনক হ্রাসও দুর্ভিক্ষে অবদান রেখেছিল বলে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বিশ্বাস করেন।

উলি-খিত দুটি আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, যে বাংলাদেশের ৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ প্রমাণ করে যে, শুধু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা সকলের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারবো না। খাদ্যের দাম ও দরিদ্রদের আয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান না করে আমাদের মত দেশে সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আমরা এটাও ৭৪ সালের শিক্ষা হিসাবে নিতে পারি যে, "খাদ্য" ঠিক সময়ে সংগ্রহ বা আমদানি করে সরকারি গুদামে পর্যাপ্ত মজুদ তৈরি করতে না পারলে সরবরাহের ঘাটতির কারণে যখন চালের দাম বাজারে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় তখন তা নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব হয় না। তখনই সৃষ্টি হয় প্রাপ্যতা সত্ত্বেও অপ্রাপ্তির সংকট। তাই উৎপাদন-আমদানী-সংগ্রহ-বিতরণ এগুলি সবই সরকারকে দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। আমাদের মত দেশে বাজারের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিলে সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিধান সম্ভব হবে না। সবশেষে এ কথাও আমরা স্বীকার করে নিব যে গরীবের সংসারে কম-সম যেটুকু খাদ্য থাকে তা যদি মজুতদার-ব্যবসায়িরা মজুত করে না রাখেন বা সরকার যদি তাদের থেকে সেটি সংগ্রহের আওতায় এনে একটি দক্ষ ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য বিতরণের (রেশন বা অন্য কোন ধরণের প্রত্যক্ষ নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি) ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলেও ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের মত সংকট থেকে আমরা ভবিষ্যতে মুক্ত থাকতে সক্ষম হব।

[১]আমেরিকান পররাষ্ট্র দফতর তখন ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে, বাংলাদেশ এখনো কিউবাতে পাটের ব্যাগ রফতানি করছে এবং কিউবা সেগুলি পরবর্তীতে উত্তর ভিয়েতনামে গেরিলাদের সরবরাহ করছে। আর সেই ব্যাগে করে ভিয়েতনামী গেরিলারা অস্ত্র বহন করছে এবং সেই অস্ত্র দিয়ে আমেরিকান সৈন্যদের হত্যা করা হচ্ছে। সুতরাং আইন অনুযায়ি পি.এল. ৪৮০-র খাদ্য সাহায্য বাংলাদেশ পেতে পারে না। যেহেতু বাংলাদেশ আমেরিকান নিরাপত্তা খর্ব করায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ : খাদ্য পরিস্থিতি

বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি সাধারণভাবে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। ১৯৭৪ বা স্বাধীনতার পর পর আমাদের দেশে যে চরম খাদ্য ঘাটতি এবং বিদেশিদের উপর পরম নির্ভরতা ছিল তা আমরা গত চলি-শ বছরে অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশের এই সাফল্য মূলত: বাংলাদেশের কৃষক সমাজের সাফল্য। তাঁরাই আগের তুলনায় কম আবাদী জমিতেই দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষের পেটের ভাত যোগানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ক্ষুদে ও মধ্য কৃষক এবং ভূমিহীন বর্গাচাষীরা অমানুষিক পরিশ্রম করে উন্নত প্রযুক্তি (যান্ত্রিক প্রযুক্তি নয়, মূলত: জৈব-রাসায়নিক উফশী প্রযুক্তি) ব্যবহার করে জমির নিবীড় ব্যবহারের মাধ্যমে এই সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছে। কোন কোন সরকার বিশেষত: ১৯৯৫ পরবর্তী সরকার কৃষকদের জন্য যে অপেক্ষাকৃত উদার কৃষি ঋণ ও ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছিল তা পরবর্তীতেও কম বেশি অক্ষুন্ন থাকায় কৃষকদের এই সাফল্য ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে আমরা খাদ্যের (খাদ্যশস্য অর্থে) প্রাপ্যতার দিক দিয়ে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কিছুদিন আগে বর্তমান খাদ্য মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী গর্ব করে দাবি করেছেন যে ২০১৩ নাগাদ বাংলাদেশ খাদ্য রপ্তানিও করতে পারে!

টেবিল : খাদ্য উৎপাদন ও চাহিদা ১৯৭১-৭২ থেকে ২০০৫-২০০৬

বছর	বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	খাদ্য চাহিদা	উৎপাদন				প্রকৃত/নেট উৎপাদন
			চাল	গম	ভূট্টা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭১-৭২	৭২.৬০	১২০১৯.৭৩	৯৭৭৪.০০	১১৩.০০	২.২০	৯৮৮৯.২০	৮৭৪৪.০৩
১৯৭২-৭৩	৭৪.৩০	১২৩০১.১৯	৯৯০১.০০	৯০.০০	২.২০	৯৯৯৩.২০	৮৮৩৫.৯৯
১৯৭৩-৭৪	৭৬.৪০	১২৬৪৮.৮৭	১১৭২০.০০	১০৯.০০	২.৩০	১১৮৩১.৩০	১০৪৬১.২৪
১৯৭৯-৮০	৮৭.৬০	১৪৫০৩.১৫	১২৫৩৯.০০	৮২৭.০০	১.০০	১৩৩৬৭.০০	১১৮১৯.১০
১৯৯৫-৯৬	১২২.১০	২০২১৫.০১	১৭৬৮৭.০০	১৩৬৯.০০	৩২.০০	১৯০৮৮.০০	১৬৮৭৭.৬১
১৯৯৬-৯৭	১২৪.৩০	২০৫৭৯.২৪	১৮৮৮০.০০	১৪৫৪.০০	৪০.৭০	২০৩৭৪.৭০	১৮০১৫.৩১
১৯৯৭-৯৮	১২৬.৫০	২০৯৪৩.৪৮	১৮৮৬১.৭১	১৮০২.৮০	৬৫.৩০	২০৭২৯.৮১	১৮৩২৯.৩০
১৯৯৮-৯৯	১২৮.১০	২১২০৮.৩৭	১৯৯০৪.৫৮	১৯০৮.৪০	৮৪.৫০	২১৮৯৭.৪৮	১৯৩৬১.৭৫
১৯৯৯-০০	১২৯.৮০	২১৪৮৯.৮৩	২৩০৬৭.০০	১৮৪০.০০	১২০.৭০	২৫০২৭.৭০	২২১২৯.৪৯
২০০০-০১	১৩১.৫০	২১৭৭১.২৮	২৫০৮৫.০০	১৬৭৩.০০	১৪৯.২০	২৬৯০৭.২০	২৩৭৯১.৩৫
২০০১-০২	১৩৩.৪৫	২২০৯৪.১৩	২৪৩০০.০০	১৬০৬.০০	১৭২.৪০	২৬০৭৮.৪০	২৩০৫৮.৫২
২০০২-০৩	১৩৫.০০	২২৩৫০.৭৫	২৫১৮৯.৮৫	১৫৯৬.৭০	১১৭.৩০	২৬৯০৩.৮৫	২৩৭৮৮.৩৮
২০০৩-০৪	১৩৬.২০	২২৫৪৯.৪২	২৬১৮৯.৪০	১২৫৩.৩০	২৪১.০০	২৭৬৮৩.৭০	২৪৪৭৭.৯৩
২০০৪-০৫	১৩৮.০৫	২২৮৫৫.৭১	২৫১৫৬.০০	৯৭৬.০০	৩৫৬.০০	২৬৪৮৮.০০	২৩৪২০.৬৯
২০০৫-০৬	১৩৯.১০	২৩০২৯.৫৫	২৬৫৩০.০০	৭৩৫.০০	৫২২.০০	২৭৭৮৭.০০	২৪৫৬৯.২৭

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো(বিবিএস)

হিসেবে দেখা যায়, সত্তরের দশকের শুরুতে দেশে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ছিল ১০ মিলিয়ন টনের মতো ২০০৬ সালের দিকে তা প্রায় ২৫ মিলিয়ন টনের মতো হয়েছে। ২০০৯ সালে এই উৎপাদন ৩০ মিলিয়ন টন ছাড়িয়ে গেছে (বিআইডিএস: ২০১০)। তবে এ কথা সত্য যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পরেও বা কাছাকাছি পর্যায়েও আমরা প্রায়ই খাদ্য আমদানি করে আসছি এবং তার পরিমান কম বেশি মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ পর্যন্ত হচ্ছে। অর্থাৎ খাদ্যের উৎপাদন এবং ১৫ কোটি মানুষের ভোগ প্রয়োজনীয়তা হিসাবে সমান হলেও কিছুটা খাদ্য আমদানীর প্রয়োজনীতা ফুরিয়ে যাবে না। তার একাধিক কারণ খাদ্য অর্থনীতির গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন।

প্রথমত: খাদ্য শস্য উৎপাদনের প্রায় ৬ থেকে ১২ শতাংশ বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করতে হয়। দ্বিতীয়ত: অনেকেই মনে করেন যে কৃষি উৎপাদন নির্ণয়ে সরকারের নিম্নপর্যায়ে তথ্য সংগ্রাহকদের মধ্যে কিছুটা উচ্চ ঝোঁক (Bias) রয়েছে। তৃতীয়ত: আমাদের দেশে সাধারণভাবে আয় বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য চাহিদা খুব কমই কমছে কারণ প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ এত গরীব যে তাদের খাদ্য চাহিদা তুলনামূলকভাবে অতটা আয় স্থিতিস্থাপক নয়। চতুর্থত: সরকারি সংরক্ষণাগারে মোট খাদ্যের ৫ থেকে ১০ শতাংশ সবসময়ই ষ্টক হিসাবে সঞ্চিত করে রাখা হয় যাতে করে প্রয়োজন মত সরকারের পক্ষে খাদ্যের সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখা যায়। এই সব কারণে উৎপাদন ভোগ চাহিদার সমান হলেও আমাদেরকে খাদ্য আমদানি অব্যাহত রাখতে হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুর্ভিক্ষের আলোচনায় আমরা প্রমাণ করেছি যে খাদ্য প্রাপ্যতা মানেই খাদ্যের অধিকারের সর্বজনীন নিশ্চয়তা নয়। যে সব কারণে খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও বাংলাদেশে ক্ষুধার্ত লোক থেকে যাচ্ছে (দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাবে মৃত্যু না হলেও!) তা মূলতঃ ত্রিবিধ-:

ক. হঠাৎ খাদ্য মূল্য বাজারে বেড়ে গেলে এবং সেই অনুপাতে নীট খাদ্য ক্রেতা দরিদ্র জনগণের আয় সংস্থান না বাড়লে তাদের খাদ্য গ্রহণ মাত্রা হ্রাস পায়। ২০০৮ সালে ড: সেলিম রায়হানের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে চালের মূল্য অকস্মিকভাবে উচ্চ হওয়াতে প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে সে ক্ষেত্রে প্রধান খাদ্য ভাতের অভাব হয়তো তেমন একটা ঘটে নি কিন্তু অন্যান্য খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভোগ নিশ্চিতভাবেই হ্রাস পেয়েছিল। ড: সেলিম রায়হান অন্তত এটুকু দেখাতে পেরেছিলেন যে দাম বৃদ্ধির দরুন দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশ উচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং খাদ্যের দাম কে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে না পারলে, নিছক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য অধিকার পুরণ করা সম্ভব হয় না।

খ. বাংলাদেশে বাজার দুর্যোগ ছাড়াও রয়েছে খরা-বন্যা-সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি নানাধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব দুর্যোগের প্রকোপ নানা কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক লোক গৃহ-হারা খাদ্য-হারা হয়ে পড়েন। তখন তাদের খাদ্য অধিকার বাজার প্রক্রিয়ায় কোনভাবেই পুরণ করা সম্ভব হয় না। তাদের জন্য প্রয়োজন হয় দ্রুত বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণের, প্রয়োজন হয় নতুন করে ব্যাপক পুনর্বাসনের কর্মসূচি। আর যতদিন সে পুনর্বাসন সম্পুর্ণ না হচ্ছে ততদিন তাদের

খাদ্য অধিকার পুরনের জন্য আপদকালীন খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার একটি সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন করতে হয় সরকার কে। এ জন্য সরকারের খাদ্য গুদামে সর্বদাই কিছু খাদ্য আগাম মজুদ রাখতে হয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রস্তুতি রাখতে হয়।

গ. তৃতীয়ত: আমরা জানি আমাদের অর্থনীতিতে বিপুলসংখ্যক লোক দরিদ্র। এখনকার হিসাব সত্য ধরে নিলে অন্তত: ২০ থেকে ২৫ শতাংশ লোক চরম দরিদ্র। অর্থাৎ তারা তাদের নিম্ন আয় দ্বারা ১৮০০ ক্যালোরি পরিমান খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এই চরম দরিদ্র গোষ্ঠীটির খাদ্য অধিকার পুরনের দুটি উপায় রয়েছে। হয় তাদেরকে মূলধারার অর্থনীতিতে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেরাই সংগ্রহ করতে পারেন অথবা তাদের জন্য এটি না হওয়া পর্যন্ত পরিপূরক খাদ্য প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশে এ জন্য রয়েছে ভি.জি.ডি, ডি.জি.এফ., কা.বি.খা, ইত্যাদি নানাধরনের নিরাপত্তাজাল কর্মসূচি। বাংলাদেশে রেশন প্রথা চালু আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য□মে তা হত-দরিদ্রদের জন্য নয়! আর নিরাপত্তা জাল কর্মসুচি যতটুকু আছে সেগুলিরও দক্ষতা ও পর্যাপ্ততা যথেষ্ট নয়। সরকারি খাতে খাদ্য বন্টনের চিত্রটি ২০০৭-১০ পর্যন্ত কিরকম ছিল তা নিচের তালিকায় তুলে ধরা হোল-

বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ (২০০৭-১০)

বিতরণ চ্যানেল ২০০৮-০৯	বরাদ্দ (মেট্রিক টন) ২০০৭-০৮	বরাদ্দ (মেট্রিক টন) ২০০৯-১০	বরাদ্দ (মেট্রিক টন)
সেলস			
এসেনসিয়াল প্রাইরিটিস্ (ইপি)	২৫৬	২৫৬	২৭৯
আদার প্রাইরিটিস্ (ওপি)	২৭	২৬	৪৫
লারজ ইমপ-য়ারস (এলই)	১২	১৩৩	২২
ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস)	৩৮৯	৩৭০	৬০০
ফ্লাওয়ার মিল/ফেয়ার প্রাইস-	-	-	
মোট	**৬৮৪**	**৭৮৫**	**৯৪৬**
নন সেলস			
ফুড ফর ওয়ার্ক (এফএফডবি-উ)	১৮৫	৩৩১	৩৭৫
টেস্ট রিলিফ (টিআর)	১৫০	২৬৩	৪০০
ভালনারএবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)	২৬৫	২৬৫	২৬৫
ভালনারঅ্যাবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ)	২৭৪	৫০০	৫৫০
গ্রাচ্যুইটি রিলিফ (জিআর)	৬৪	৬৪	৬৪
ভিজিএফ (রিলিফ)	-	-	-
হিলট্রাক্স/আদারস	৭৫	৯২	৭৫
মোট	**১০১৩**	**১৫১৫**	**১৭২৯**
সর্বমোট	**১৬৯৭**	**২৩০০**	**২৬৭৫**

উপরের আলোচনার একটি প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে যে এখানে খাদ্য বলতে আমরা শুধু শর্করা জাতীয় প্রধান খাদ্য চালকেই বুঝিয়েছি। কিন্তু যদি খাদ্য বলতে আমরা সুপেয় পানি, প্রোটিন, ভিটামিন, এগুলিকে প্রয়োজনীয় হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আমাদের দেশে খাদ্য অধিকার পুরণ হয় নি এরকম লোকের সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পেত। যদিও একথা সত্য যে সম্প্রতি প্রশংসণীয়ভাবে আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর হার এবং শিশুর পুষ্টিহীনতা হ্রাস পেয়েছে কিন্তু তারপরেও সাধারণভাবে পুষ্টিহীনতা বিশেষত: প্রোটিনহীনতা এখনও প্রচুর। নারীদের ক্ষেত্রে এর আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আন্তর্জাতিকভাবে বা তুলনামুলকভাবে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির চিত্রটি কেমন তা নীচের তালিকায় তুলে ধরা হোল। তালিকাটি "দ্য গে-াবাল হাংগার ইনডেক্স" বা GHI প্রণেতারা তৈরি করেছেন। সেখানে GHI index এর যে সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে:

G H I	=	(PUN + CUW + CM)/3
G H I	=	Global Hunger Index.
PUN	=	Proportion of the population under-nourished (in %)
CUW	=	Prevalence of underweight children younger than five (in %)
CM	=	Profortion of children dying before the age of Five (in %)

নীচের ২নং তালিকার প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৯০-২০১১ অর্থাৎ গত ২১ বছরে সামগ্রিক "ক্ষুধা পরিস্থিতির" ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় এক ধাপ নেমে গেছে, পক্ষান্তরে নেপালের অবস্থান এক ধাপ উপারে উঠে গেছে। শ্রীলংকা, ভারত এবং বাংলাদেশ নিজ নিজ অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে।

তালিকা-২

দেশের নাম	১৯৯০		২০১১	
	স্কোর	র‍্যাংক	স্কোর	র‍্যাংক
বাংলাদেশ	৩৮.১	পঞ্চম	২৪.৫	পঞ্চম
ভারত	৩০.৪	চতুর্থ	২৩.৭	চতুর্থ
নেপাল	২৭.১	তৃতীয়	১৯.৯	দ্বিতীয়
শ্রীলংকা	২০.২	প্রথম	১৪.০	প্রথম
পাকিস্তান	২৫.৭	দ্বিতীয়	২০.৭	তৃতীয়

উৎস: ২০১১ গে-াবাল হাংগার ইনডেক্স, সামারি

যদিও উন্নতির হার এই তিন দেশের মধ্যে বাংলাদেশেরই ছিল সর্বোচ্চ। বাংলাদেশে "ক্ষুধার্তের সূচক" হ্রাস পেয়েছে ৩৬ শর্তাংশ। শ্রীলংকায় তা হ্রাস পেয়েছে ৩১ শতাংশ এবং ভারতে তা হ্রাস পেয়েছে ২২ শতাংশ। আমরা যদি পাকিস্তানের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো সেখানে ক্ষুধার্তের সূচক হ্রাস পেয়েছে সবচেয়ে কম অর্থাৎ ২১ বছরে মাত্র ২০ শতাংশ। নেপালের ক্ষেত্রে হ্রাসের হার ছিল ২৭ শর্তাংশ। কিন্তু এতে আমাদের আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ তুলনামূলক অগ্রগতির হার এই সময় যাইই হোক না কেন ম বা র‍্যাংক অনুযায়ি বাংলাদেশের অবস্থান এখনো রয়ে গেছে সর্বনিম্নে অর্থাৎ পঞ্চম। ম অনুযায়ি দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষুধার্তের সূচক সবচেয়ে কম এবং প্রথম স্থান অধিকারী দেশটি হচ্ছে শ্রীলংকা। তার পরপরই রয়েছে দ্বিতীয় নেপাল, তৃতীয় পাকিস্তান, চতুর্থ ভারত এবং সর্বশেষ বা পঞ্চম হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু তার পরেও বলবো যে

বাংলাদেশে ১৯৯০-৯২ সালে যে জায়গায় অপুষ্টিতে আ□ান্ত লোকের অনুপাত ছিল ৩৮ শতাংশ, ২০০৭ এ এসে তা হয়েছে ২৭ শতাংশ। নিম্ন ওজনের শিশুর অনুপাত ১৯৮৮-৯২ সালে যে জায়গায় ছিল ৬১.৫ শতাংশ, ২০০৪-০৯ সালে তা কমে হয়েছে ৪১.৩ শতাংশ। এবং সর্বশেষে শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ সালে যে জায়গায় ছিল ১৪.৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে তা কমে হয়েছে মাত্র ৫.২ শতাংশ। কিন্তু যেহেতু আমাদের সামগ্রীক ক্ষুধার সূচক এখন ২৪.৫ শতাংশ যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ সেহেতু আমাদের সন্তুষ্ট হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রতি আশে-পাশের চার জন মানুষের মধ্যে গড়ে একজন অপুষ্টিতে ভুগছেন। এই ছিম-ছাম ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি যারা পড়ছেন তাদের মধ্যে হয়তো কম লোকই সেরকম হবেন, কিন্তু রংপুরের মঙ্গা অঞ্চলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় বা নিঝুম দ্বীপের মত কোন চরাঞ্চলে যদি আমরা যাই বা থাকি তাহলে ক্ষুধা কি জিনিষ তা আমরা খুব স্পষ্টই দেখতে পাব। অথবা মরা কার্তিকে যদি গ্রামে যাওয়া যায় বিশেষত: সেই সব এলাকায় যেগুলি খরা প্রবণ, বন্যা প্রবণ এবং লবনাক্ততা প্রবণ তাহলেও আমরা দেখতে পাব ক্ষুধা সাময়িকভাবে হলেও কি ভাবে অনেক ঘরে হানা দিতে শুরু করেছে। বাজার যখন তেতে উঠে বাংলাদেশে তখন মায়েরা-বোনেরা যে একটু খাওয়ার মান ও গুণ কমিয়ে দেন তা আমরা নজর দিলেই দেখতে পাব। এছাড়া শহরের সমস্ত অনানুষ্ঠানিক খাতের উদায়স্ত পরিশ্রমী শিশু ও নারী শ্রমিকদের খাবারের বাসনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলেও আমরা দেখতে পাব অপুষ্টি ও ক্ষুধা কাকে বলে। এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মাদের এবং কম বয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলেও আমরা বুঝতে পারবো "পেটে ক্ষুধা মুখে লাজের" চেহারাটা কিরকম দেখায়। এমনকি মার্কসের তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে কিভাবে শ্রমঘন শিল্পের মালিকরা শ্রমিককে তার ন্যূনতম শ্রমশক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচটুকু যোগান দিচ্ছেন না সেটার উদাহরণও আমরা কোন কোন পোশাক শিল্পের অদক্ষ সর্বনিম্ন শ্রমিকদের দিকে তাকালে অনায়সেই বুঝতে সক্ষম হব।

যে সব তথ্যের ভিত্তিতে "গে-াবাল হাংগার ইনডেক্স" তৈরি হয়েছে তার দুটো সমস্যা রয়েছে। প্রথম: এসব তথ্যের ভিত্তি হচ্ছে আদম-শুমারী নয়। তথ্যভিত্তি হচ্ছে নমুনা চয়ন করে অনুমিত পরিমাপ। অতএব এগুলিতে নমুনা বিচ্যুতির আশংকা থাকে। তবে একইভাবে বছরের পর বছর তথ্য সংগৃহীত হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে পরিবর্তনের গতিমুখটি এবং পরিবর্তনের হারটি অন্তত: সঠিক ভাবেই নির্ণীত হয়েছে। এই দিক থেকে বলতেই হবে যে বাংলাদেশে গত ২১ বছরে "ক্ষুধা পরিস্থিতিতে" উলে-খযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এই GHI Index এর দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতাটি হচ্ছে এর সময় ব্যবধান। ২০১১ এর সুচক তৈরির জন্য আমরা ব্যবহার করছি তিন বছর আগের তথ্য অর্থাৎ ২০০৮ সালের তথ্য। ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন মাত্রায় নিকটবর্তী তথ্য অবশ্য থাকতেও পারে, যে ক্ষেত্রে তথ্যের সম সময় রক্ষিত হয় না। যেমন ২০১১ সালে যে ৩টি মাত্রা ব্যবহার করে GHI Index তৈরি করা হয়েছে তাতে অপুষ্টিতে ভুগছে এরকম নরনারীর অনুপাত ধরা হয়েছে ২৭ শতাংশ আর এই তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে ২০০৫-০৭ সালের তথ্য থেকে। কম ওজনের শিশুদের (অনুর্ধ পাঁচ বছর) অনুপাতের সর্বশেষ তথ্যটি (৪১.৩ শতাংশ) আবার ২০০৪-০৯ এর

তথ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং সর্বশেষ শিশু (অনুর্ধ পাঁচ বছর) মৃত্যুর হারের তথ্যটি (৫.২ শর্তাংশ) নেওয়া হয়েছে ২০০৯ সালের তথ্য থেকে। সুতরাং তথ্যের একটি সময়গত গ্যাপ বা ইংরেজিতে যাকে বলে gestation গ্যাপ রয়েই গেছে। দ্বিতীয়তঃ এই সূচকটি অন্য প্রচলিত সব সূচকের মতই একটি গড় সূচক।

আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি গড় সূচকের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিশাল এক শ্রেণীভেদের ফাঁকি। খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি এই শ্রেণীভেদ না বুঝলে পুরোপুরি কখনোই বোঝা সম্ভব হবে না। আমরা তখন ভাবতে থকবো বা আমাদের অভ্যস্ত চিন্তায় বা নির্মিত সম্মতি (Manufactured Consent) অনুযায়ি আমাদের সবাই মেনে নিবেন যে যদিও সমাজের অর্ধেক শরীর রয়েছে চুল-ীর আগুনে এবং অর্ধেক শরীর রয়েছে সুশীতল ফ্রিজে, গড়ে সমাজের তাপমাত্রা হচ্ছে নাতি-শীতোষ্ণ।

বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে করণীয় সুপারিশ

পরিস্থিতি শুধু ব্যাখ্যা করে লাভ কি, পরিস্থিতি কি ভাবে বদলানো যায় সেটিই আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তাই আগের দুই অধ্যায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা করণীয়গুলি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম না হই। অবশ্য সেটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ নয়। আরো কঠিন কাজ হচ্ছে করণীয় প্যাকেজটির বাস্ত বায়ন। সে ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হচ্ছে কে বা কারা এটি করবেন তথা এজেন্সির নির্ধারণ। সেই এজেন্সির প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও অঙ্গীকার আছে কি না তা বিচার এবং না থাকলে নতুন এজেন্সি নির্মাণের প্র□য়া উদ্ভাবন। মোটামুটি এই ফ্রেমওয়ার্কে আমি আমার সংক্ষিপ্ত করণীয় সুপারিশগুলি নিচে তুলে ধরছি।

খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে

প্রথম করণীয় হচ্ছে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন। যদি খাদ্য প্যাকেজের মধ্যে আপাতত: আমরা শুধু শর্করা-প্রোটিন-ভিটামিন ধরি, তাহলে আমাদের পর্যাপ্ত চাল-গম, মাছ-দুধ-ডিম এবং শাক-শব্জি উৎপাদনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এর প্রধান এজেন্ট হচ্ছে গ্রামের মানুষ। কৃষক ও কৃষি সংশি-ষ্ট উৎপাদকবৃন্দ। কিন্তু তাদের সাহায্য করতে হবে জমি দিয়ে, ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ দিয়ে ও ন্যায্য মূল্যে খাদ্য ফসলগুলি □য় করে। বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত ফসলের সংরক্ষণ ও প্র□য়ার ব্যবস্থাও এ ক্ষেত্রে থাকতে হবে। বর্তমানে কোন কোন কৃষক কিছুটা নিজের জমিতে এবং কিছুটা অন্যের জমি ভাড়া নিয়ে, কেউবা সবটা জমিই ভাড়া নিয়ে আর কেউ কেউ পুরোটাই নিজের জমিতে চাষ করে থাকেন। উৎপাদনের আগে উৎপাদকের কাছে উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং উৎপদানের পর উৎপাদনের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের কাজটি এখন অংশত: রাষ্ট্র এবং অংশত: আড়তদার, ফঁড়িয়া ব্যবসায়ীরা করে থাকেন। আমরা সবাই জানি কৃষকদের এ ক্ষেত্রে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে "ন্যায্য মূল্যে উপকরণ পাই নি" "ন্যায্য সুদে কৃষি ঋণ পাই নি" এবং "ন্যায্য দামে ফসল বি□ করতে পারি নি।" বর্গা চাষীদের আরেকটি বাড়তি অভিযোগ হচ্ছে জমির ভাড়া নিয়ে।

উৎপাদকদের সমবায় গড়ে তুলতে হবে

এই অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য প্রচলিত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলি হচ্ছে ভুর্তকী দিয়ে কৃষি উপকরণ ডিলারদের মাধ্যমে সরবরাহ করা (এ ক্ষেত্রে ইদানিং ফেয়ার প্রাইস কার্ড ইত্যাদি কিছু সংস্কার হয়েছে।) কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কম সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ (এ ক্ষেত্রে বর্গাচাষীদের ঋণ প্রাপ্তির স্বপক্ষে একটি নতুন আইন হয়েছে।) এবং নির্দিষ্ট সময়ে বাজার থেকে ফসল □য়ের উদ্যোগও সরকার নেন। ভূমি সংস্কার বা ভূমিসত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু Lip Service ছাড়া কোন অগ্রগতি নেই। বলাবাহুল্য অন্য উদ্যোগগুলিও পর্যাপ্ত হচ্ছে না। কারণ সরকারি এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠানগুলি আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ভুগে এবং তাদের অর্থ সংকটও রয়েছে। তাই আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমাজকে শক্তিশালী করতে বলেছিলেন সে ভাবে সরকারের উচিৎ হবে "উৎপাদকদের সমবায়" গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে উৎপাদক পরিবারের কাছে সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নেয়া। এতে বিচ্ছিন্ন কৃষক পরিবারগুলি বর্তমানে যে ভাবে ধনী কৃষক বা ধনী ব্যবসায়ী বা ধনী চাল কল মালিক বা তাদের মিত্র আমলাতন্ত্রের কাছে অসহায় ও বন্দি হয়ে আছেন সেটা থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু এই নতুন এজেন্সি তৈরি হবে কি ভাবে?

এটা তৈরি হতে পারে তলদেশে নিজস্ব উদ্যোগে। রাষ্ট্রের সমবায় মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে এক বিশাল সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু তার আগে তার কর্মচারিদের মধ্যে সমবায় উদ্দীপনা ও সমবায় অঙ্গীকার জাগ্রত করতে হবে। নিদেন পক্ষে সরকার বর্তমানে এই প্র□য়ায় সহায়তা করার জন্য ভারতের মত " স্বসাহায্যকারী" গ্রুপদের জন্য বিশেষ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট এবং সেখানে ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এর ফলে গ্রামে বর্তমানে ধনী চাষী, আমলাতন্ত্র ও এন.জি.ও দের যে মিশ্র বলয়টি রয়েছে তার বাইরে মধ্য-গরীব ও ভূমিহীনদের একটি নতুন শক্তি বলয় গড়ে উঠতে পারে। তবে একদম ক্ষুধার্ত যে ২৫ শতাংশ মানুষ তাদের জন্য অবশ্য প্রথম প্রয়োজন হবে ন্যূনতম খাদ্য, তারপরে হয়তো তাদের পক্ষে সংগঠিত হওয়া অসম্ভব হবে না।

নিরাপত্তা জাল কর্মসূচির ফাঁক-ফোকর বন্ধ করতে হবে

যদি ক্ষুধার্ত ২৫ শতাংশকে আমরা খাদ্য পৌঁছে দিতে চাই তাহলে বর্তমানে প্রচলিত নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি দিয়ে তা হতে পারে কিন্তু এতে প্রচুর অদক্ষতা বিদ্যামান। এটা এ্যাড হক ও সাময়িক কর্মসূচি যা সাধারণত হাল্কা মৌসুমে অনুসৃত হয়–সে জন্য এটা যথেষ্টও নয়। এর পরিমানও পর্যাপ্ত নয়। তদুপরী যেই চ্যানেলে এটা পৌঁছানো হয় তাতে অনেক ফাঁক-ফোঁকড় রয়েছে। কারো কারো মতে প্রায় ২০ শতাংশই এই ফাঁক দিয়ে দুর্নীতিবাজরা আত্মসাত করে নেয়। এই সমস্যার সমাধান অবশ্য আসতে হবে কেন্দ্রিয়ভাবে। কেন্দ্র থেকে যেমন আমরা একটি ভোটার আই ডি. নির্মাণ করেছিলাম। তেমনি আমাদের হত-দরিদ্রদের একটি কেন্দ্রিয় ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। সেই লোকদের শুধু শতাংশ হিসাবে দেখলে চলবে না...তাদের নাম-ধাম ঠিকানা-পেশা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। প্রতি অর্থবছরের শেষে ঐ তালিকা পুনরায় পরীক্ষা করে নবায়ন করতে হবে কারণ আমরা আশা করবো প্রতি অর্থবছর শেষে তাদের অন্তত: তিন থেকে পাঁচ শতাংশ পরিবার উর্ধে উঠে যাবেন

এবং তারা নিজেরাই তখন বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম হবেন। আমাদের সমস্ত নিরাপত্তা জাল কর্মসূচিগুলিকে (বলা হয় এ ধরনের কর্মসূচির সংখ্যা প্রায় ৮৪টি!) এক ছাতার তলে এনে এগুলিকে সরাসরি ঐ ২৫ শতাংশের অভিমুখে (গ্রামে এবং শহরে) ধাবিত করতে হবে। এটা করার জন্য দরকার কেন্দ্রিয় অঙ্গীকার এবং তৃণমূলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অঙ্গীকার। দু:খের বিষয় এই দুটি শর্তই এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত। তাই এখানে সমাজে যারা জনগণকে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের বর্তমানে এই কর্মসূচির পক্ষেও প্রেশার গ্রুপ হিসাবে এগিয়ে আসতে হবে। নিম্নতম ২৫ শতাংশকে তাদের নিজস্ব স্বার্থেই এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে। অর্থের বা খাদ্যের প্রলোভনে, আ□মণের ভয়ে, কোনভাবেই তারা যাতে আত্মসমার্পন না করেন সে জন্য তাদের আত্মশক্তি ও মনোবল জাগ্রত করার কোন বিকল্প এখানে নেই। তাদের এই সংঘ শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োজন হবে তাদের জন্য প্রদত্ত খাদ্য পাহারা দেওয়ার জন্য শুধু নয়, তাদের উচ্চতর জীবিকায় প্রবেশের জন্যও তাদের তা দরকার হবে। বিশেষভাবে বর্তমানে আইনত: যে খাস জমি তাদের প্রাপ্য কিন্তু বেআইনিভাবে অসৎ ধনী ও ক্ষমতাবানেরা যা দখল করে রয়েছে সেগুলি উদ্ধারের আন্দোলনও তাদের সংঘ শক্তি ছাড়া অসম্ভব।

মজুদ বাড়তে হবে, মজুদ ব্যবস্থাপনায় সমবায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

সর্বশেষে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপদ এবং বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শকের বিপদ। এই দুই আপদকালীন পরিস্থিতির জন্য সরকারের খাদ্য গুদামে মোট উৎপাদনের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ খাদ্যশস্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় গুদাম নির্মাণের কাজটি শুরু হয়েছে কিন্তু আরো দ্রুত তা তৈরি হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সংরক্ষণাগার ও হিমাগার তৈরির কর্মসূচিও জরুরি ভিত্তিতে তৈরি করা প্রয়োজন। এগুলির রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তৃণমূলে আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে উৎপাদকদের সমবায়ের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। ভূমিহীনদের সমবায় বা তৃণমূল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেও অর্পন করা যেতে পারে।

এসবক্ষেত্রে আমাদের সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেরা চীনে গিয়ে চীনের বিদ্যমান বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনার মডেলটি শিখে আসতে পারেন। কি ভাবে প্রয়োজনীয় দুর্যোগের মুহূর্তে দ্রুত প্রতি□য়া জ্ঞাপন করতে হয় সেটিও আমরা চীনের সর্বশেষ ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

দরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রেশনিং

এ দেশে বিশেষ সুবিধাভোগীদের জন্য সাপ্তাহিক রেশনের মাধ্যমে পরিবারের রেশনকার্ডধারীদের সংখ্যা অনুসারে নির্ধারিত পরিমানের চাল-গম-ভোজ্য তেলসহ নানাধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপন্য সরবরাহের একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থাটির নাম রেশনিং ব্যবস্থা। ব্রিটিশ আমল থেকে চালু এই রেশনিং ব্যবস্থার সুবিধা সাধারণত: এ যাবৎ পেয়ে এসেছেন সামরিক বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রক সরকারি সংস্থার সদস্যসমূহ। অতীত সরকারি শ্রমিক-কর্মচারিদের কোন কোন অংশও এই রেশনিং সুবিধা ভোগ করেছেন। পল-ী

অঞ্চলেও খুব সীমিত পরিমাণ একধরনের 'মডিফাইড রেশনিং' ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনার জটিলতা ও দুর্নীতির কারণে এর পরিধি অত্যন্ত সংকুচিত করে ফেলা হয় এবং এখন এই সুযোগ প্রধানত: সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বি.ডি.আর, আনসার ইত্যাদি আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রক সংস্থার সামরিক-আধাসামরিক সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সম্প্রতি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে রেশনিং-এর প্রস্তাব দেয়া হলে– মালিকরা "ঝামেলার" কথা বলে তা প্রত্যাখান করেছেন। তবে অর্থনীতিবিদদের মতে ২৫ শতাংশ হতদরিদ্রদের সঠিক তালিকা প্রণীত হওয়ার পর তাদেরকে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে একটি স্থায়ী রেশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে পারলে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হবে।

সঠিক তথ্যের ব্যবহার ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে

বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে শক সেটা প্রশমিত করার জন্য আমরা বর্তমানে শহরে-গ্রামে ও.এম.এস. প্রথার আশ্রয় নিয়ে আসছি। এটার সাফল্য নির্ভর করবে পর্যাপ্ত স্টকের এবং সঠিক সময় যথাযথ মাত্রায় তা বিতরণের উপর। এ জন্য সরকারকে সঠিক তথ্যের অধিকারী হতে হবে। প্রতি বছর উৎপাদন, আমদানী ও চাহিদার সঠিক পরিমাপের উপর নির্ভর করে সরকারকে স্টক সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এখানে সরকারের পরিসংখ্যান ভিত্তি খুব দুর্বল। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্বলতা রয়েছে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করার ক্ষেত্রে। এখন ধান সংগ্রহ না করে সরকার চাল সংগ্রহ করে থাকেন। সরকারি সংগ্রাহকরা বলেন যে ধানে কৃষকরা পানি ভেজান বলে তাদের জন্য ধানের চেয়ে চাল কেনাটাই বেশি লাভজনক। কিন্তু আসলে সরকারি খাদ্য দপ্তরকে ভেবে দেখতে হবে তাদের এই □য় অভিযান কি কৃষককে যথাযথ মূল্য প্রণোদোনা দেয়ার জন্য চালানো হয় না কি সবচেয়ে কম দামে তাদের নিজস্ব খাদ্য স্টক তৈরির জন্য চালানো হয়। যদি উদ্দেশ্য প্রথমটি হয় তাহলে তাদেরকে চাল সংগ্রহের নীতি থেকে ধান সংগ্রহে সরে আসতে হবে এবং ধানের Cost+Normal Profit=Price নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্য সবচেয়ে ভাল হয় যদি উৎপাদকদের সমবায়ের অধীনে চাল কল ও গুদাম নির্মাণ সম্ভব হয়।

চালের "দাম" জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এখন □মশ: সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই সঠিক সময়ে সঠিক দামে খাদ্য পন্যগুলি □য় করে মজুদ করে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের সার্বক্ষণিক মনিটরিং প্রয়োজন। বড় বড় আমদানীকারকরা বর্তমানে IT ব্যবহার করে তা করছেন। কিন্ত IT কে তারা ব্যবহার করছেন ফাটকাবাজী এবং বাড়তি মুনাফার উদ্দেশ্যে। আমরা সরকারকে পরামর্শ দেব টি.সি.বি.- কে সক্ষম করে তুলে IT ব্যবহার করে বাজারে জাতীয় ও আন্তর্জতিক দামের স্বচ্ছতা বিধান ও বাজার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে। রেডিও -টিভি. মিডিয়াকেও এই স্বচ্ছতা বিধানের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু স্বচ্ছতা বিধান করেই দুর্বল উৎপাদক এবং দুর্বল ভোক্তা উভয়ের বাজার ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাজারের তীব্র ওঠা-নামা বা অস্থিতিশীলতা তখন আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত আঘাতে আর জর্জরিত করতে সক্ষম হবে না।

উপসংহার

আমরা এই প্রবন্ধে বলার চেষ্টা করেছি যে খাদ্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। সর্বপ্রথম সভ্য সমাজকে সেটিই পুরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আমরা দেখিয়েছি খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা থাকলেই সকলের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত হয় না। এমনকি প্রাচুর্যের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়।

আমরা বলেছি খাদ্য অধিকার পুরণের পথে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনেকগুলি ও অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। তাই এ সমস্যা সমাধানের কর্মসূচিকে হতে হবে সামগ্রীক ও বহুমুখী। আমরা বলেছি বাংলাদেশে গত ২০ বছরে খাদ্য পরিস্থিতির লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এর মূল কৃতিত্ব বাংলাদেশের কৃষক সমাজের এবং ১৯৯৫ উত্তর কৃষিবান্ধব নীতিমালার। আমরা বলেছি বাংলাদেশে এখনো এক চতুর্থাংশ মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছেন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের ক্ষুধা পরিস্থিতি এখনো সবচেয়ে নাজুক।

আমরা এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমবায়কে তার প্রধান চালিকাশক্তি করার সুপারিশ করেছি। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ২৫ শতাংশ হত দরিদ্রদের জন্য কেন্দ্রিয় ডাটা-বেস তৈরি করে তাদের জন্য সরাসরি দুর্নীতিহীন খাদ্য সরবরাহের প্রস্তাব করেছি। আমরা পর্যাপ্ত গুদাম ও হিমাগার নির্মাণের সুপারিশ করেছি। আমরা সমাজের নিম্ন আয়ের ভোক্তাদের খাদ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ ইতিবাচক স্বীকৃতির নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেছি বাজারকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। বাজার নিয়ন্ত্রণ ও বাজার বহির্ভূত ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের দুর্বল শ্রেণী গুলির স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সে জন্য কম পক্ষে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করার প্রতি আমরা জোর দিয়েছি। আমাদের আমলাতন্ত্রকে চীন থেকে বিকেন্দ্রিভূত কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনা শেখার জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি।

সবশেষে যারা খাদ্য অধিকার বঞ্চিত তাদের নিজস্ব সংঘ শক্তি ও আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। এ ক্ষেত্রে আই.টি ব্যবহার করে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সরকার নিশ্চিত করে সহায়ক ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেন বলে আমরা মনে করি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. লীলা দুবে ও সৌরভ দুবে (১৯৮৭), "পলিটিক্স অব ফুড," জার্নাল অফ সোশ্যাল ষ্টাডিজ, ভল্যুম-৩৭, জুলাই ১৯৮৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. এ কে সেন (১৯৯৯), ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ফ্রীডম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়া দিল্লী।

৩. ষ্টুয়ার্ট আর ষ্ক্র্যাম (১৯৭৬) (সম্পা:) , মাও সে তুং আনরিহার্সড টক্স এন্ড লেটারস্, পেঙ্গুইন বুকস্, ইউকে।

৪. মহিউদ্দিন আলমগীর (১৯৭৮), "দ্য লো লেভেল পভার্টি ইকুরিলিব্রির্য়াম ট্র্যাপ, বি.আই.ডি.এস, ঢাকা।

৫. আখতার উদ্দিন আহমেদ, পল ডরোশ, কাজী শাহাবুদ্দিন, রুহুল আমিন তালুকদার, "ইনকাম গ্রোথ, সেফটি নেটস এন্ড পাবলিক ফুড ডিষ্ট্রিবিউশন", বাংলাদেশ ফুড সিকিউরিটি ইনভেষ্টমেন্ট ফোরাম, মে-২০১০।

৬. ২০১১, গে-াবাল হাঙ্গার ইনডেক্স

৭. ইনষ্টিটিউট অফ গভর্নেন্স ষ্টাডিজ (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়), দ্য ষ্টেট অফ গভর্নেন্স-২০০৯, ঢাকা।

৮. এম. এম. আকাশ, "এক্সপেরিয়েন্সেস অফ দ্য প্রপার্টি রাইট রিফর্মস ইন চায়না এ হোয়াট দ্য কোঅপারেটিভ মুভমেন্ট ক্যান লার্ন ফ্রম ইট",–বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা, ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংকলন, গৌরবের ঐকতান, ১৯ শে নভেম্বর ২০১১, খুলনা।

৯. এম. এম. আকাশ, "বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি: বাস্তবতা ও করণীয়", পি.কে.এস.এফ. আয়োজিত সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ। নভেম্বর ২০১০, ঢাকা।

১০. BIDS, "Recent performance of the Bangladesh Economy: An assessment of the state of the economy and short-term outlook 2009-10", 23 February 2010

সেমিনার প্রতিবেদন : 'খাদ্য অধিকার ও খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি'

গত ১২ মে ২০১২ শনিবার সকাল ১০.৩০টায় সিরডাপ মিলনায়তনে খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলনের আয়োজনে **খাদ্য অধিকার ও খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি** শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূলবক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। আলোচক হিসেবে ছিলেন বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক বিনায়ক সেন, ব-াস্টের সাম্মানিক পরিচালক এবং খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলনের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সারা হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন কৃষি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসাইন, গবেষক এবং খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলনের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য মনোয়ার মোস্তফা, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কাজী এনায়েত হোসেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মাহবুব হোসেন, কৃষক নেতা জায়েদ ইকবাল, সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ সম্পাদক জীবনানন্দ জয়ন্ত প্রমুখ। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলনের সদস্য সচিব জাকির হোসেন। এই সেমিনারে খাদ্য অধিকার আন্দোলনভূক্ত সংগঠন ব-াস্ট, সিসিডিবি, স্কোপ, নাগরিক উদ্যোগসহ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাচুর্যের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়

এম এম আকাশ
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, খাদ্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। সর্বপ্রথম সভ্য সমাজকে সেটিই পূরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা

থাকলেই সকলের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত হয় না। এমনকি প্রাচুর্যের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। খাদ্য অধিকার পূরণের পথে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনেকগুলো ও অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। তাই এ সমস্যা সমাধানের কর্মসূচিকে হতে হবে সামগ্রিক ও বহুমুখী। তিনি বলেন, উৎপাদন-আমদানী-সংগ্রহ-বিতরণ এগুলো সবই সরকারকে দক্ষতার সাথে করতে হবে। গরীবের সংসারে কম-সম যেটুকু খাদ্য থাকে তা যদি মজুতদার-ব্যবসায়ীরা মজুদ করে না রাখেন বা সরকার যদি তাদের থেকে সেটি সংগ্রহের আওতায় এনে একটি দক্ষ ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য বিতরণের (রেশন বা অন্য কোন ধরনের প্রত্যক্ষ নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি) ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলেও ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের মতো সংকট থেকে আমরা মুক্ত থাকতে সক্ষম হবো। চালের দাম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এখন □মশ সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই সঠিক সময়ে সঠিক দামে খাদ্যপণ্যগুলো □য় করে মজুদ করে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের সার্বক্ষণিক মনিটরিং প্রয়োজন। বড় বড় আমদানীকারক বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা করছেন। কিন্তু তারা এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন ফটকাবাজি বা বাড়তি মুনাফার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, টিসিবিকে সক্ষম করে তুলে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দামের স্বচ্ছতা বিধান ও বাজার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশে গত ২০ বছরে খাদ্য পরিস্থিতির লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশে এখনো এক চতুর্থাংশ মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছেন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের ক্ষুধা পরিস্থিতি এখনো সবচেয়ে নাজুক। হত-দরিদ্রদের জন্য কেন্দ্রিয় ডাটা-বেস তৈরি করে সরাসরি দুর্নীতিহীন প্র□িয়ায় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা জরুরি। পর্যাপ্ত গুদাম ও হিমাগার নির্মাণ জরুরি। বাজারকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। বাজার নিয়ন্ত্রণ ও বাজার বহির্ভূত ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের দুর্বল শ্রেণীগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সেজন্য কমপক্ষে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করার প্রতি আমরা জোর দিয়েছি। আমাদের আমলাতন্ত্রকে চীন থেকে বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনা শেখা দরকার। খাদ্য অধিকার বঞ্চিত জনসাধারণকে তাদের নিজস্ব সংঘ শক্তি ও আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।

মাসিক ভাতা শ্রমজীবী মানুষের দৈনিক মজুরির চেয়ে কম হলে তা কাজে আসে না

ড. বিনায়ক সেন
গবেষণা পরিচালক, বিআইডিএস

ড. বিনায়ক সেন বলেন, সারা দেশে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ তিনবেলা খেতে পারে না। এই ক্ষুধার্তদের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ শুধু ঢাকাতেই থাকে। আমাদেরকে অধিকারের সাথে দায়িত্বের কথা ভাবতে হবে। আমাদের সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তরা

কোন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। এই মধ্যবিত্তরা নিম্নবিত্তদের জন্য কিছু করে না। এই মধ্যবিত্তদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, সামাজিক নিরাপত্তার নামে সরকার যে ৮৪টি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার প্রায় সবই ভুয়া। সামাজিক নিরাপত্তার মাসিক ভাতা শ্রমজীবী মানুষের দৈনিক মজুরির চেয়ে কম হলে সেদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কোনো কাজে আসে না। যে বরাদ্দ প্রতিবছর বিভিন্ন খাতে দেয়া হয়, তা খুবই স্বল্প–এটাকে টোকেন বলা যায়। এসমস্ত বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, ধনিক শ্রেণীকে দায়িত্ববান হতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক কর্মসূচি গ্রহন না করে সুনির্দিষ্টভাবে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গত বাজেটে সম্পদের উপর কর ধরা হয়েছিল, বাংলাদেশে মোট ১২৮ জন লোক পাওয়া গেছে, তাদের ২ কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে। অসংখ্য কোটিপতিদের খুঁজে বের করে তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারে রাষ্ট্র কিছু করছে না। সম্পদের উপর কর নির্ধারণে বর্তমান বাজার দরকে হিসাবে আনতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের সাথে কর আদায়ের বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে।

তিনি বলেন, খাদ্য অধিকার বলতে শুধু খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নয়, পুষ্টির বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। আবার নারী ও শিশুর অধিকারকে কোনোভাবেই খাদ্য অধিকার থেকে আলাদা করা যায় না। খাদ্য অধিকার ব্যাহত হওয়ার জন্য শুধু সরকার আর বাজার ব্যবস্থাকে দায়ী করলে হবে না। এর পাশাপাশি রয়েছে- ক. সিভিল সোসাইটির ব্যর্থতা; খ. স্থানীয় কমিউনিটির ব্যর্থতা, কারণ কোনো কমিউনিটির কোন লোক না খেয়ে আছে সেটা কমিউনিটির মানুষরা খোঁজখবর নেয় না বা জানে না; গ. ধনিক শ্রেণীর কর্মকাণ্ড। ড. বিনায়ক সেন আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে এদেশের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ভারতের ফারাক্কা বাঁধের কারণে কতজনের প্রাণহানি হলো রাষ্ট্রের কাছে সে প্রশ্ন কখনো করা হয় না।

মানুষ না খেয়ে মারা গেল, এটাও বিচার-বহির্ভূত হত্যা

সারা হোসেন
সাম্মানিক পরিচালক, ব-ইস্ট

সারা হোসেন বলেন, নাগরিকদের নিজেদের দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। খাদ্য অধিকার বিষয়ে কী কী নির্দিষ্ট আইন আছে তা দেখে তা প্রয়োগের বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আছে, প্রতিষ্ঠানগুলো সে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছে

না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া আছে, সেটা নিয়ে কেউ কথা বলে না। শুধু সফায়ারই বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নয়, ৫০ জন মানুষ যদি না

খেয়ে মারা যায়, এটাও বিচার-বহির্ভূত হত্যা। মানুষের মৌলিক মানবাধিকার বিষয়ে তদন্ত ব্যুরো হওয়া দরকার। না খেয়ে অপুষ্টিতে যারা অল্প বয়সে মারা যায় তাদের তথ্য আমাদের কাছে নেই। এই নীরব দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ একটা জরুরি কাজ। তিনি বলেন, সংবিধানে বেঁচে থাকার অধিকার সুনির্দিষ্টভাবে থাকলেও, খাদ্য অধিকার সরাসরি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। সামাজিক নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে এখনই নাগরিক সমাজ, অর্থনীতিবিদ ও মানবাধিকার কর্মীদের একযোগে কাজ করতে হবে। এদেশের বিচার ব্যবস্থা দরিদ্রদের জন্য কিছু ভাবে না। বস্তি উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু বস্তিবাসীদের জন্য কোনো আদেশ দেওয়া হয় না। গণমাধ্যমকেও সবার জন্য কথা বলতে হবে।

জনগণের খাদ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে

মনোয়ার মোস্তফা
স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

গবেষক মনোয়ার মোস্তফা বলেন, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের চুক্তি ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের যেটা দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। আমরা গণখাদ্য বিতরণ থেকে সুনির্দিষ্ট গ্রুপ অ্যাপ্রোচের দিকে চলে যাচ্ছি। তাও □মান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। ৯১ সালে ১৫ টার মতো খাদ্য সম্পর্কিত কর্মসূচি ছিল, এখন তা ১২টা। আবার খাদ্যের গণবণ্টনের যে ১২টি প্র□িয়া এটা নিয়েও টানাটানি হয়। এছাড়া আমরা সেলস্ চ্যানেল থেকে নন সেল চ্যানেলের দিকে বেশি ঝুঁকে

পড়েছি। তাও সেটা ভোটের সময় কাজ করে। এক ধরনের দান-খয়রাতের দৃষ্টিতে রয়ে গেছে। এর আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। খাদ্য অধিকারের তাত্ত্বিক বিতর্কগুলোর ফায়সালা করতে হবে এবং একে অধিকারের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বিপণন ব্যবস্থার যে দুর্বলতা তা দূর করতে হবে

অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসাইন
কৃষি অর্থনীতিবিদ

কৃষি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসাইন বলেন, কৃষি বিপণন ব্যবস্থা মৃতপ্রায়। এখানে অনেক কিছু করণীয় আছে। সেটির প্রতি মূল প্রবন্ধে নজর দেওয়া হয়নি। তথ্য সংগ্রহ করে কৃষি বিষয়ক তথ্য বিতরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করা

যাবে না। বিপণন ব্যবস্থার যে দুর্বলতা তা দূর করতে হবে। উন্নত বিশ্বে বিপণন ব্যবস্থায় কৌশলী মেকানিজম রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে মনে করা হয়, মুক্তবাজার অর্থনীতি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিবে। সমবায়ের যে মূলনীতি, সেটার উপর ভিত্তি করে এখনো কোনো দল গড়ে ওঠেনি। কো-অপারেটিভ সেক্টর কোনো কাজই করে না।

ঘুরে ফিরে কৃষকই বঞ্চিত হচ্ছে

রাজেকুজ্জামান রতন
সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, তেল ও সারের দাম বৃদ্ধির জন্য ধান উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কৃষক যখন ধান বা চাল বি করতে যাবে তখন প্রতি কেজিতে দাম ১ টাকা কম পাবে। অন্যদিকে কৃষকের এই ধান যখন চাল হয়ে যাবে এবং সে যখন আবার কিনতে যাবে তখন সে আবারও বঞ্চিত হবে। ফলে কৃষক এরূপ একটা সমস্যায় পড়ছে। বর্তমানে কথা শুনছি, কৃষক ঝলক ধানের ঝলকানিতেও সর্বশান্ত হয়েছে। চমক ধানের চমক দেখেও আমার অবস্থা একই রকম মনে হয়। এছাড়া টমেটো উৎপাদনে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত। জীবনের জন্য আরো একটা খুব প্রয়োজন জিনিস হলো পোল্ট্রি। শত শত পোল্ট্রি ধ্বংস হচ্ছে। এর প্রভাব সামগ্রিকভাবে কৃষির উপর পড়ছে এবং আমরা যারা ভোক্তা তাদের উপরও পড়ছে। আমাদের এখন নিম্ন মধ্যবিত্তদের আয়ের ৮০% ব্যয় হচ্ছে খাদ্য কিনতে ও বাসাভাড়ার জন্য। পাশাপাশি পরিবহন খরচ বাড়ছে, বাড়ি ভাড়া বাড়ছে। সুতরাং মানুষ কোথায় খরচ কমাবো।

খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কাজে লাগাতে হবে

জীবনানন্দ জয়ন্ত
সাধারণ সম্পাদক, সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন

জীবনানন্দ জয়ন্ত বলেন, রাষ্ট্র কাঠামোগত সমন্বয়-এর নামে ব্যয় সংকোচনের বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে মান্বয়ে সংকুচিত করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে খাদ্য এবং শিক্ষা খাতকে সংকুচিত করে রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচন কি আসলে হয়েছে? আসলে রাষ্ট্রের ব্যয় সংকোচনের খাত সুচিন্তিতভাবে বের করতে হবে। আরেকটি বিষয় আমাদের ভাবনায় নিয়ে আসা উচিত, তা হলো হাইব্রিড ফসল অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে কিন্তু এখান থেকে আমরা কোন অবস্থাতেই বীজ সংরক্ষণ করতে পারি না। যা আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি আমরা দেখলাম 'ঝলক' ধানে মার খেয়েছে কৃষক। এ বিষয়গুলো কিন্তু মিডিয়াতে সেভাবে উঠে আসেনি। কারণ এর সাথে যুক্ত রয়েছে বড় বড় কোম্পানির স্বার্থ। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কাজে লাগাতে হবে।

খারাপ বীজ সরবরাহকারী কোম্পানিকে আইনের আওতায় আনতে হবে

জায়েদ ইকবাল
কৃষক ফেডারেশন

জায়েদ ইকবাল বলেন, যেসব কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কৃষকদেরকে খারাপ বীজ সরবরাহ করে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। আরেকটি কথা বলতে চাই, তা হলো কৃষক এক মন ধান উৎপাদন করার জন্য যে টাকা ব্যয় করছে, বিি করে তা পাচ্ছে না। অর্থাৎ কৃষক মার খাচ্ছে, জমি হারাচ্ছে, মার্কেটের কাছে ধরা খাচ্ছে। কৃষকের কাছে যখন ফসল আছে তখন সে ফসলের দাম পাচ্ছে না। তিনি কৃষক নেতা আব্দুস সাত্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'গরীব মানুষের রোগ হচ্ছে ক্ষুধা। এই রোগ নিবারণের ঔষধ হলো খাদ্য।' সুতরাং আমরা এত কিছু বুঝি না। আমরা কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন করি, এ খাদ্যের সার্বভৌমত্ব আমাদের। সরকার কৃষকের এই সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে। কৃষকরা সবসময় ভূক্তভোগী হচ্ছে আর মুনাফা লুটে নিয়ে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা।

ভূমি দস্যুদের হাত থেকে কৃষি জমি রক্ষা করতে হবে

ড. মাহবুব হোসেন
অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মাহবুব হোসেন বলেন, ভূমি দস্যুদের হাত থেকে কৃষি জমি রক্ষা করতে হবে। ভূমি দস্যুরা সর্বত্র গরিবের জমি দখল করছে। প্রতি বছর ১% জমি কমছে। এটা প্রতিরোধে মানবাধিকার কমিশনসহ সবাইকে অসহায় মনে হচ্ছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা সেখানে প্রশ্নবোধক। সবাইকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও খাদ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ছে

কাজী এনায়েত হোসেন
সদস্য, স্টিয়ারিং কমিটি, খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

কাজী এনায়েত হোসেন বলেন, বর্তমানে খাল-বিল-নদী-নালা-জলাশয়সহ প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসগুলি ভরাট, দখল ও দূষণ হচ্ছে। তাই মাছ ও অন্যান্য প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট খাদ্য কমে যাচ্ছে। সংগত কারণেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও খাদ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে আমাদের সবার গুরুত্ব দিতে হবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা

ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পাওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের চুক্তি সাধিত হয়েছে। তাই সকল নাগরিকের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানুষের খাদ্য অধিকার নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পন্থা পরিহার করতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে। আমরা যে সমাজে বাস করছি, সেখানে রাষ্ট্র এতো শক্তিশালী যে অধিকারের

দাবি ছাড়া জনগণ প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে পারে না। তিনি আরো বলেন, কৃষককে খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সরকারকে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উপযোগী করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে যেন তারা তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পায়, খাদ্য উৎপাদনে আগ্রহ না হারায়। সরকার সচরাচর বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। মুখে দুর্নীতি দমনের কথা বললেই দুর্নীতি দমন হয় না। কালো টাকা সাদা করার অর্থ হলো, রাষ্ট্র দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া। তিনি বলেন, সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক যে কর্মসূচিগুলো চালু আছে সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। যাদের জন্য এসব কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে তারাই যেন এর সুফল পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের জীবনের বিনিময়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পন্থা পরিহার করতে হবে।

খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির স্বচ্ছতা আনতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে

জাকির হোসেন
সদস্য সচিব, খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

খাদ্য অধিকার আন্দোলনের সদস্য সচিব জাকির হোসেন সভার সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন, খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে চলমান কর্মসূচির বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, বেআইনি খাদ্য মজুদ ও সিন্ডিকেট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, এ সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রণয়নে সরকার এবং নীতি নির্ধারকদের সংবেদনশীল করা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করবে। তিনি এ বিষয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

সেমিনারের সুপারিশসমূহ

সেমিনারে উপস্থিত অতিথি ও আলোচকদের কাছ থেকে যে সমস্ত করণীয় ও সুপারিশগুলি বেরিয়ে এসেছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. সমস্ত নিরাপত্তা জাল কর্মসূচিগুলিকে (বলা হয় এ ধরনের কর্মসূচির সংখ্যা প্রায় ৮৪টি!) এক ছাতার তলে এনে এগুলিকে সরাসরি হত-দরিদ্র ২৫ শতাংশের অভিমুখে (গ্রামে এবং শহরে) ধাবিত করতে হবে;

২. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় যে মাসিক ভাতা প্রদান করা হয় তা খুবই স্বল্প–এটাকে টোকেন বলা যায়। এই টোকেন সিস্টেম পরিবর্তন করে ভাতার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং চালু কর্মসূচিগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

৩. কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ করতে পারে তার জন্য প্রতিটি উপজেলায় জরুরি ভিত্তিতে একটি করে সংরক্ষণাগার ও হিমাগার তৈরি করতে হবে এবং এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তৃণমূলে আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে উৎপাদকদের সমবায়ের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

৪. ২৫ শতাংশ হত দরিদ্রদের সনাক্ত করে কেন্দ্রিয় ডাটা-বেস তৈরি করতে হবে এবং তাতে এলাকাভিত্তিক চিত্র থাকতে হবে।

৫. খাদ্য সংশি-ষ্ট যে সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে তাকে দান-খয়রাতের জায়গা থেকে বের করে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে;

৬. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে ঘিরে দুর্নীতির বিস্তার সর্বগ্রাসী। এক্ষেত্রে অবিলম্বে জিরো-টলারেন্স নীতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দুর্নীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক দুর্নীতিও বন্ধ করতে হবে–বিশেষত সুবিধাভোগী বাছাইয়ের সময়।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো ঐতিহাসিকভাবে গ্রামমূখী। কিন্তু দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব এখন শহরেও বিপুল। কারণ হত দরিদ্ররা অনেকেই শহরমুখীও বটে। ফলে নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো গ্রামের পাশাপাশি শহরেও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

৮. কেবলমাত্র চাল-গম নয়, চাল-গম উৎপাদনের পাশাপাশি মাছ-দুধ-ডিম এবং শাক-সবজি উৎপাদনের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য কৃষককে ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ দিয়ে ও ন্যায্য মূল্যে খাদ্য ফসলগুলি □য় করে সাহায্য করতে হবে;

৯. কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কম সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং উৎপাদকদের সমবায় গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে উৎপাদক পরিবারের কাছে সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নেয়া;

১০. খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে কাজে লাগাতে হবে এবং যে সমস্ত কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান খারাপ বীজ সরবরাহ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

□ম	নাম	প্রতিষ্ঠান
১.	ড. মিজানুর রহমান	চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
২.	অধ্যাপক এম এম আকাশ	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩.	ড. বিনায়ক সেন	গবেষণা পরিচালক, বিআইডিএস
৪.	সারা হোসেন	সাম্মানিক পরিচালক, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এণ্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব-াস্ট)
৫.	মনোয়ার মোস্তফা	খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন
৬.	জাকির হোসেন	খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন
৭.	অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসাইন	বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)
৮.	রাজেকুজ্জামান রতন	সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
৯.	মেসবাহুন নাহার	আরডিআরএস
১০.	সাইদুর রহমান	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
১১.	সুব্রত ব্যানার্জি	সিসিডিবি
১২.	শাহানুর ইসলাম	বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী আন্দোলন
১৩.	রুমানা বেগম	ভাসমান নারী শ্রমিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১৪.	সালমা	ভাসমান নারী শ্রমিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১৫.	মিরানা আক্তার	পার্টনারশীপ অব উইমেন ইন অ্যাকশান (পাওয়া)
১৬.	শামসুজ্জামান	ভাসমান নারী শ্রমিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১৭.	রহিমা	ভাসমান নারী শ্রমিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১৮.	ইফতেখার হোসেন	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
১৯.	গবিন্দ চন্দ্র কর	বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী আন্দোলন
২০.	শামীম হোসেন	নাগরিক উদ্যোগ
২১.	রিজিয়া বেগম	ভাসমান নারী শ্রমিক উন্নয়ন কেন্দ্র
২২.	মো. নূরুল আমিন	এডাব
২৩.	হোজ্জাতুল ইসলাম	নাগরিক উদ্যোগ
২৪.	হামিদুল ইসলাম হিলে-াল	তথ্য অধিকার আন্দোলন
২৫.	জীবনানন্দ জয়ন্ত	ডিপিএফ
২৬.	তানিয়া আফরিন তম্বি	আইন ও সালিশ কেন্দ্র
২৭.	সরদার জাহিদুল ইসলাম	নাগরিক উদ্যোগ

□ম	নাম	প্রতিষ্ঠান
২৮.	এইচ. জে এম. কামাল	কেয়ার, বাংলাদেশ
২৯.	মজিবর রহমান	নাগরিক উদ্যোগ
৩০.	বাকার বকুল	নাগরিক উদ্যোগ
৩১.	রাশেদুল ইসলাম রাশেদ	বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টি
৩২.	আহসানউল-াহ কাঞ্চন	বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টি
৩৩.	উম্মে ফাহমিদা	নাগরিক উদ্যোগ
৩৪.	কাজী এনায়েত হোসেন	স্কোপ
৩৫.	বকুল হোসেন	নাগরিক উদ্যোগ
৩৬.	আমিনুর রসুল	উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট
৩৭.	মাজহারুল ইসলাম	ডায়াকনিয়া
৩৮.	আবু নাসের	নাগরিক উদ্যোগ
৩৯.	সেলিনা বানু	এএসডি
৪০.	বাকিয়া সুলতানা	দলিত নারী ফোরাম
৪১.	এ বি এম অনিসুজ্জামান	বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)
৪২.	অসিম চ্যাটার্জি	নাগরিক উদ্যোগ
৪৩.	সাইফুন্নাহার	দলিত নারী ফোরাম
৪৪.	এম এ গনি	সি এস বি
৪৫.	জাহিদ ইকবাল খান	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন
৪৬.	উম্মেহানি বিনতে আরিফ	ব্রাস্ট
৪৭.	শৈলেন পাল	ইউডিআইসিএইচইই
৪৮.	অমিত রঞ্জন দে	খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন
৪৯.	ফেরদৌস আরা রুমী	খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন
৫০.	মিঠু আহমেদ	নাগরিক উদ্যোগ
৫১.	ফারহানা ফেরদৌস	এএলআরডি
৫২.	শারমিন ইসলাম	নেটসজ (NETZ) বাংলাদেশ
৫৩.	মজিবুল হক মনির	কোস্ট ট্রাস্ট
৫৪.	মো. আব্দুল হাই	জেনিথ ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন
৫৫.	মো. আতিকুর রহমান সোহেল	জেনিথ ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন
৫৬.	শিহাব আহমেদ সিরাজী	ব্রাস্ট
৫৭.	মিহির বিশ্বাস	বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)
৫৮.	শাহেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫৯.	মো. আলাউদ্দিন	এ জে ডি

খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো চলমান বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত থাকে সে বিষয়ে সোচ্চার হওয়া। খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা এবং এ ব্যাপারে আইন ও নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখাও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

দেশে প্রান্তিক মানুষের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকার বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ক্রমাগত বরাদ্দ বাড়ালেও উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে এর সুফল কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে না। পাশাপাশি এইসব কর্মসূচি 'সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভিত্তিতে' পরিচালিত হয়ে থাকে। একে অধিকারভিত্তিক করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। এ বিষয়ে নীতিনির্ধারক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল করা, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জনসমাজে সচেতনতা তৈরি এবং আইন ও নীতিমালা তৈরি ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে এই আন্দোলন অঙ্গিকারাবদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশি ও আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং যৌথ কার্যক্রম গ্রহণেও এ আন্দোলন আগ্রহী।

RtF&SS Campaign for Right to Food & Social Security
খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা আন্দোলন

সচিবালয়: **নাগরিক উদ্যোগ**
বাড়ি নং ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৮৬৮, ০১৭১৩১৩১৩৪৮, ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
E-mail: rtfssbd@gmail.com, info@nuhr.org
website: www. rtfss.org